সুখ না দুঃখ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)

মানুষ সুখের জন্য লালায়িত এবং দুঃখকে পরিহার করিবার জন্য সর্বতোভাবে যত্নশীল। সুখের জন্য, অর্থাৎ সুখ বলিতে যাহা বুঝার বা যে যা বুঝে তাহারই জন্য, অন্বেষণ ও তাহার লাভের চেষ্টাই জীবন। শুধু মনুষ্যজীবন কেন, ইতর প্রাণীর পক্ষে সুখের চেষ্টাই জীবনপ্রবাহ, এবং স্থূল হিসাবে সুখান্বেষণ চেষ্টার ফলেই জৈবিক অভিব্যক্তি। এস্থলে সুখ কি, সুখের অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে বিতর্ক তোলার প্রয়োজন নাই। সুখ অর্থে নিজের পক্ষে যে যাহা বুঝে, সে তাহাই লক্ষ্য-স্বরূপে গ্রহণ করে। একের উদ্দেশ্য-একের লক্ষ্য পদার্থ-অন্যের প্রথনীয় হউক আর নাই হউক, নিজ নিজ লক্ষ্যের অভিমুখে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চেষ্টার সমবেত ফলে জগৎ চলিতেছে; জীবজগতে অভিব্যক্তি তাহার ফলেই ঘটিয়া আসিতেছে। অভিব্যক্তির আর পাঁচটা কারণ থাকিলেও ডারুইনের প্রদর্শিত অভিব্যক্তিপ্রণালী স্থূল কথার এই।

যদিও আবহমানকাল ধরিয়া মানুষের এই চেষ্টা এবং সুখান্বেষণেরই নাম জীবনপ্রয়াস, তথাপি মানবের জীবনে সুখের ভাগ অধিক কি দুঃখের ভাগ অধিক, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বহুকাল হইতে এই প্রশ্নের মীমাংসা লইয়া দলাদলি চলিতেছে। এক পক্ষের মতে, জীবনে সুখের মাত্রা নিশ্চিতই অধিক; অন্য পক্ষ বলেন দুঃখের পরিমাণ সুখের পরিমাণকে চিরকালই ছাড়াইয়া রহিয়াছে। হইতে পারে, প্রথম পক্ষ নিজ জীবনে দুঃখ অপেক্ষা সুখের আস্বাদন অধিক মাত্রায় পাইয়াছেন; তাঁহারা সুস্থচোখে সকলই সুন্দর দেখেন, এবং কুৎসিত হইতে স্বাভাবতঃ দূরে থাকিয়া কুৎসিতের অস্তিত্ব জগতে নাই বলিতে চাহেন। অপর পক্ষ আপনি জীবনে তাদৃশ সৌভাগ্যশীল নহেন; তাঁহাদের রুগ্ন চক্ষু সুরূপকেও বিকৃত দেখে, এবং নৈরাশ্যের দুর্বলতায় তাঁহাদের শিথিল পদদ্বয় দুঃখের পঙ্ক হইতে উঠিয়া সুখের শুষ্ক বর্ত্মে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। এরূপ স্থলে তাঁহাদের মতামত আপন আপন জীবনের অনুভূতির প্রতিফলিত ছায়ামাত্র; জগতে সুখ-দুঃখের তারতম্যনির্ণয়ে তাঁহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই। বলা বাহুল্য, যুক্তির ভার কোন্ পক্ষে গুরুতর, তাহা স্থির করাই প্রধান সমস্যা; নিক্তির কাঁটা কোন্ দিকে হেলিয়াছে, তাহা ঠিক দেখিবার উপায় থাকিলে এতদিন মীমাংসা হইয়া যাইত। কেন না, বিচারকেরাও বিচারকালে আপন আপন স্বভাবদত্ত চশমা চোখে না দিয়া থাকিতে পারেন না; কাজেই কেহ বলেন এদিক্ ভারী, কেহ বলেন ওদিক্।

প্রথম পক্ষের প্রধান যুক্তি এক কথায় এই ঃ—জীবনের সুখ অধিক, জীবনের অস্তিত্ব তাহার প্রমাণ। জীবনে সুখ না থাকিলে, অর্থাৎ সুখের মাত্রা অধিক না হইলে, মানুষ বাঁচিতে চাহিবে কেন? মানুষ যে বাঁচিতে চায়,—অবশ্য দুই চারিটা আত্মঘাতীকে বর্জন করিয়া—ইহাই সুখের মাত্রাধিক্য প্রমাণ করিতেছে। মানবজীবনে দুঃখের ভাগ অধিক

হইলে মানবের জন্য দড়ি কলসী যোগান এতদিন 'বিরাট' ব্যাপার হইত; বসুধা এতদিন জীবহীন মরুভূমিতে পরিণত হইত। আধিব্যাধি মরণ-যাতনা, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, প্রণয়ে কৃত্রিমতা, ধর্মের নিপীড়ন, নিরীহের পেষণ, সকলের উপর ধর্মের মুখোস্‌পরা অধর্মের জয়জয়কার, এসব নাই এমন নহে; তবে স্নেহ দয়া ভক্তি মমতা সরলতা প্রেম ইহারাও আকাশকুসুম বা ভাষার কল্পিত অলঙ্কার নহে। এই সকলও জগতে বর্তমান আছে, এবং ইহাদের পরিমাণ সর্বতোভাবে অধিক বলিয়াই মানুষ আহার নিদ্রা সম্বন্ধে ভালরূপে বন্দোবস্তে আজিও অত্যন্ত ব্যাপৃত; নতুবা অভিব্যক্তি, অন্ততঃ মানুষের অভিব্যক্তি অভিব্যক্তিবাদের সমর্থনের জন্য প্রয়াস ও অবকাশ পাইতে হইত না। মোটের উপর মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্বরক্ষণার্থ প্রয়াসই বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে যথেষ্ট উত্তর।

আজিকালি যাঁহারা ধর্মশাস্ত্রকে নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহারা দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। কেননা, দুঃখের ক্ষয়সাধন ও সুখের বর্ধনই অভিব্যক্তির মর্ম ও উদ্দেশ্য; দুঃখ না থাকিলে অভিব্যক্তি ঘটিত না; অভিব্যক্তি যখন ঘটিতেছে, তখন দুঃখ আছে বৈকি। নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য, এবং জীবনের প্রবাহ সেই উদ্দেশ্যের মুখেই চলিতেছে বলিয়া সামাজিক উন্নতি। যাহা সমাজের পক্ষে মোটের উপর সুখপ্রদ তাহাই ধর্ম, আর যাহা দুঃখপ্রদ বা মোটের উপর দুঃখপ্রদ, তাহাই অধর্ম। ধর্মাধর্মের এইরূপ তাৎপর্য শুনিয়া প্রথমে ভয় জন্মিতে পারে, কিন্তু 'সুখ' শব্দটার প্রতি যথেচ্ছ পরিমানে আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্চ অর্থ প্রয়োগ করিয়া আশ্বস্ত হওয়া যাইতে পারে। সুখ শব্দে কেবলই যে নিম্ন পর্যায়ের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক সুখই বুঝিতে হইবে, এমন আইন নাই। সুখ কি? না যাহাতে জীবন বর্ধন করে; এবং জীবনবর্ধনের ন্যায় মহৎ উদ্দেশ্য আর কি আছে? এইরূপে সুখ শব্দটার ব্যাখ্যা করিলে ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। যাহা হউক, মনুষ্যজীবনের ও মনুষ্যসমাজের উন্নতি ক্রমশঃ হইতেছে, ইতিহাস যদি ইহা সমর্থন করে, তবে সুখের মাত্রা ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে বলিতে হইবে। কখনও পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে; এবং সর্বক্ষণেই তদানীন্তন দুঃখের মাত্রা অপেক্ষা তদানীন্তন সুখের মাত্রা অধিক, নতুবা লোকে জীবনবর্ধনের প্রয়াস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস পাইত; ধর্মনীতি উল্টাইয়া যাইত; দয়াদাক্ষিণ্য পাপের পর্যায়ে ও চুরি-ডাকাতি ধর্মের পর্যায়ে স্থান পাইত। যখন তাহা হয় নাই, তখন অবশ্যই মানুষ মোটের উপর সুখী।

ডারুইনের লিখিত পুঁথি কয়খানা জগতের দৃশ্যপটকে অনেকটা বদলাইয়া দিয়াছে। পূর্বে যেখানে শান্তি প্রীতি ও মাধুর্য দেখা যাইত, এখন সেখানে কেবল হিংসা দ্বেষ শোণিততৃষ্ণা ও নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব দেখা যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যেটাকে ঋষিদের তপোবনের মত 'শান্তরসাস্পদ' বোধ হইত, এখন নাদির সাহের অনুগৃহীত দিল্লী তাহার কাছে হারি মানে। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিবিভ্রম! জীবজগগতে বিদ্যমান এই নির্মম দ্বন্দ্ব আবার

মনুষ্যসমাজেরও উন্নতির মূল একথা বলিতে গিয়া অনেকে গালি খাইয়াছেন, এবং গালি অঙ্কের অভিনয় যে শীঘ্র থামিবে এরূপ ভরসা অল্প। কিন্তু যাঁহারা জগতের এই বিভীষিকাময় চিত্র দেখান, তাঁহারা অথবা তাঁহাদের চেলারাই আবার জীবনের সুখময়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, ইহাই বিস্ময়কর। উপরে যে নবগঠিত ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি, হবার্ট স্পেন্সার ইহার একজন প্রধান প্রচারক; এবং হাবার্ট স্পেন্সার একালের অভিব্যক্তিবাদের একজন প্রধান 'পাণ্ডা'।

ডারুইনের প্রদর্শিত চিত্র দেখিলে জীবনের সুখময়ত্বে বিশ্বাস করা বড়ই দুঃসাহসিক ব্যাপার হয়; কেননা, হিংসা ও রক্তপাতই যেখানে উন্নতির প্রধান উপায়, সেখানে আর সুখ কি? রক্তপাত করিয়া ঘাতকের আপন মনের মত তৃপ্তি কিয়ৎ পরিমাণে জন্মিতে পারে; কিন্তু সেও ক্ষণিকমাত্র; জঠরজ্বালারূপ সনাতন মহাদুঃখ নিবারণের জন্যই জীবের এই হত্যাব্যবসায়; আহার সম্পাদনের পরক্ষণেই আবার জঠরজ্বালায় পুনরাবির্ভাব। আর যে হন্যমান তাহার পরোপকারবৃত্তি যে সে সময়ে অত্যন্ত প্রবল হয়, এবং তজ্জন্য যে পরার্থ জীবনদান করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে, তাহারও প্রমাণাভাব। যাহাই হউক, ডারুইন-তত্ত্বের অন্যতর প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ আলফ্রেড ওয়ালাস্ ইহারও উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ওয়ালাস্ এ হেন ভীষণ ক্ষেত্রেও ক্লেশের অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিতে চাহেন। জীবজগতে রক্তপাত আছে, কিন্তু হিংসা আছে, ক্লেশ নাই। হত্যাকর্মের দর্শক যেমন ভয় পান, যাহার উপর কর্মটা নিষ্পন্ন হইতেছে, সে ততটা ভয় পায় না। দয়াশীল প্রকৃতির এমনই সুচারু নিয়ম যে, হন্যমান জীবের অনুভূতির তীব্রতা থাকে না; এমন কি, তাহার বোধশক্তি হননকালে লোপ পায়, এরূপ অনুমানের হেতু আছে। প্রহারের দর্শন শ্রবণ বা কল্পনা ভয়ানক; কিন্তু প্রহার খাইতে তেমন কষ্ট নাই। সকলে পরীক্ষা করিতে সম্মত হইবেন কিনা সন্দেহ। তবে ওয়ালাসের যুক্তি ফেলিবার নহে। কিন্তু ওয়ালাসের প্রয়াস কতদূর সফল হইয়াছে, বলা যায় না। প্রহারভোগে যেন ক্লেশ খুব অল্প হইল, বা না হইল, তবে প্রহারদর্শনও ত নিত্য ঘটনা। এবং প্রহারদর্শনে যদিও দুঃখ হয় ও প্রহারের নিবারণও যদি অসাধ্য হয়, তবে জগতে দুঃখের লোপ হইল কই? আবার দুঃখের অস্তিত্ব উড়াইতে গেলে সুখের অস্তিত্বও উড়িয়া যায়; কেন না, দুঃখ আছে বলিয়াই ত সুখও আছে। একের অস্তিত্ব অন্যের সাপেক্ষ। আবার দুঃখ হইতে মুক্তির চেষ্টাই ত অভিব্যক্তি। কাজেই দুঃখ অস্তিত্বহীন বলিতে গেলে বর্তমান জীবনদ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তিবাদই ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। ওয়ালাস্‌ও যে স্বপ্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের এই মূলোচ্ছেদে সম্মত হইবেন, তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে প্রকৃতির সমুদায় বিধানই দুঃখের লঘুকরণের অভিমুখী, এই পর্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ যাঁহারা জীবনকে দুঃখময় বলেন, তাঁহারা ওপক্ষের যুক্তিতর্ক না শুনিয়া সুখাধিক্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিতে চান। কই, খুঁজিয়া দেখিলে সুখ ত সংসারে মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য; পক্ষান্তরে দুঃখের মত সুলভ সামগ্রী কিছুই নাই। দারিদ্র্যকে দুঃখ বল, সংসারে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; ধনী কয়টা? অজ্ঞানে দুঃখ বল, জ্ঞান কোথায়?

আবার অধর্মে দুঃখ বল, পৃথিবীতে ধর্ম অধিক না অধর্ম অধিক? ধার্মিক যেখানে দুইটা, অধার্মিক সেখানে দু'শটা; আবার ধার্মিক দুইটার ধার্মিকত্ব প্রমাণসাপেক্ষ; অধার্মিক দু'শটার অধার্মিকতায় সন্দেহ নাই। আবার মূল কথা লইয়া দেখ। জীবনচেষ্টা যাহাকে বল, সে ত, কেবল জীবনরক্ষার বা দুঃখলোপের প্রয়াস মাত্র। কিন্তু হায়! অধিকাংশ স্থলে সেই প্রয়াস কি পণ্ডশ্রমমাত্র নহে? আবার মানসিক জীবনের প্রধান ভাগই কামনা বা আকাঙ্ক্ষা। কামনা বা আকাঙ্ক্ষা লইয়াই জীবনের সমুদায় কার্য; বুদ্ধি কি চিন্তা কি অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ত কামনারই ভরণপোষণ ও পরিচর্যা কার্যে নিযুক্ত। সেই কামনার অর্থ কি? না, বর্তমান অভাবের, বর্তমান ক্লেশের, দূরীকরণের প্রবৃত্তি। অর্থাৎ জীবন মূলেই দুঃখময়, অভাবময়। অভাবময়তা না থাকিলে কামনা থাকিত না, জীবনের প্রয়োজন থাকিত না। জীবনের সংজ্ঞাই যেখানে 'দুঃখময়তা' হইল, দুঃখময়তার দূরীকরণের নিষ্ফল প্রয়াসেই জীবনের সমাপ্তি হইল, সেখানে জীবন দুঃখময় কি সুখময় তাহা প্রশ্ন করা বাতুলতা। যেখানে অভাবের শেষ, সেইখানে জীবনপ্রবাহও রুদ্ধ; অভাবের পরম্পরাতেই জীবন লীলা। বাঁচিবার ইচ্ছা সুখের ইচ্ছা নহে, উহা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির ইচ্ছা তবে নিষ্কৃতি ঘটে না। জীবন দুঃখময়, যেহেতু জীবন জীবন।

তবে সুখ বলিয়া কি কিছুই নাই? সুখ দুঃখের অভাবমাত্র। আর সুখের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা কি দেখা য়ায়? ধর, সুখও আছে, দুঃখও আছে। কিন্তু সুখের তীব্রতা নাই; দুঃখের তীব্রতা আছে। "সুখ যত স্থায়ী হয় তত কমে; দুঃখ যত থাকে তত বাড়ে। এমন কি, অতিরিক্ত সুখই দুঃখ হইয়া দাঁড়ায়; দুঃখকে সুখ হইতে কখনও দেখা যায় না। সংসারে চাহিয়া দেখ, শোক, হিংসা, ঈর্ষা, পরিতাপ সবই দুঃখময়; যৌবন, স্বাধীনতা, দুঃখের তাৎকালিক অভাবমাত্র; ধন মান প্রণয় সুখের আশা দেয়, কিন্তু আনে দুঃখ; স্নেহ মায়া মমতা, ইহারাও অধিকাংশ দুঃখেরই মূল; জ্ঞান, ধর্ম, তাহারা ত অন্তর্দৃষ্টির প্রসার বাড়াইয়া অনুভূতির তীক্ষ্ণতা জন্মাইয়া দুঃখভোগেরই সুবিধা করিয়া দেয়।" যে জ্ঞানী, যে ধার্মিক, তাহার দুঃখভোগ-শক্তি অধিক; তাহার দুঃখও অধিক। মানুষেরই ত দুঃখ, কষ্ট পাথরের আবার দুঃখ কি?

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে দুঃখের মাত্রা কমিতেছে বলাও চলে না। উন্নত কে? না, যার দুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভুগিতে জানে, অতএব ভোগে। যাহার চেতনা নাই, তাহার দুঃখ নাই। নিকৃষ্ট জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবের অনুভূতি প্রখর; নিকৃষ্ট মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ণ। সুতরাং দুঃখানুভবশক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি। যেখানে উন্নতি অধিক, সেখানে দুঃখও অধিক। ফিজি দ্বীপের লোকে বুড়া বাপকে রাঁধিয়া খায়; বিদেশী কাবাবাসীর জন্য হইয়ার্ডের প্রাণ কাঁদে; কার দুঃখ অধিক?

মোটের উপর জীবনে সুখ থাকা অসম্ভব, এবং জীবনের উদ্দেশ্য সুখ নহে। মানুষ বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিতে চায়, তাহাতে সুখের প্রমাণ হয় না; তাহাতে প্রাকৃত শক্তির নিকটে মানুষের পূর্ণ অধীনতা সপ্রমাণ করে মাত্র। মানুষ অন্ধ শক্তির বশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া

মরিতেছে; ফাঁদ এড়াইতে গিয়া ফাঁদে পা দিতেছে; দুঃখ এড়াইতে গিয়া দুঃখে পড়িতেছে; তথাপি তাহার জ্ঞান হয় না; তথাপি সে বাঁচিতে চায়। প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুতুল মানুষ। ইহাই প্রধান রহস্য। বুদ্ধিমান্ যে আত্মঘাতী। সে প্রকৃতিকে ঠকায়।

একালের দুঃখবাদীদের মধ্যে শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যান অগ্রণী। সুখের আশা নাই; সভ্যতার বৃদ্ধি ও জ্ঞানের উন্নতি দুঃখই বাড়াইবে; সুখের বাঞ্ছা ত্যাগ কর; কামনা নিরোধ কর; তোমার জীবন, তৎসঙ্গে জাতীয় জীবন, শূন্যে সমাহিত হউক। সফূর্তিমান্ ইংরেজ যে মোটের উপর সুখবাদী হইবেন বুঝা যায়; কিন্তু বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জর্মানিতে কিরূপে দুঃখবাদের প্রাদুর্ভাব হইল, ভাল বুঝা যায় না।

এদেশের দার্শনিকদের মুক্তিবাদ বা নির্বাণবাদ এই চিরন্তন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার ফল। বৈদিক আর্যগণের দুঃখবাদী হইবার বড় অবসর ছিল না। ইন্দ্রদেব, তুমি জল দাও, ফল দাও, পশু দাও; প্রজা দাও বলিয়া যাঁহারা যাগাগ্নিতে হব্যধারা ঢালিতেন, তাঁহাদের জীবনের প্রতি একটা বিশেষ আসক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরবর্তীকালে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার সহিত জীবনে অতৃপ্তির ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব দেখা যায়। বৌদ্ধ পন্থায় তাহার পরিণতি। দুঃখপাশ হইতে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের চেষ্টাই ভগবান্ বুদ্ধদেবের জীবন। তারপর হইতে হিন্দুশাস্ত্র নানা ভাবে সেই একই কথা বলিয়াছে; মুক্তি লাভের নানা উপায় আলোচনা করিয়াছে; যিনি যখন বুদ্ধগৌতমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কর্মসংস্কারে হাত দিয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে সেই পুরাতন কথা; কামনা নিরোধ কর, কর্ম ভস্মসাৎ কর, মুক্তি লাভ করিবে। আধুনিক ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে।

কবিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতের মিল দেখা যায় না। হইতে পারে কাব্যে যাহা দেখি, তাহা কবির নিজ জীবনের অনুভবের প্রতিবিম্বমাত্র। কালিদাস যে কখনও সুখ ও সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না; ইন্দুমতীর মৃতদেহে শ্রমজলবিন্দু যাঁহার নজরে পড়ে, শোকমূর্চ্ছিতা রতিকে যিনি বসুধালিঙ্গানধূসরস্তনী দেখেন, তিনি যে মরণের ন্যায় প্রকাণ্ড ব্যাপারটাকে "প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্" বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া কেবল সৌন্দর্যদর্শনেই ব্যাপৃত থাকিবেন, বিচিত্র নহে। রামায়ণ মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ-সঙ্গীত। তবে বৈরাগ্য অবলম্বন ইহার উপদেশ নহে। সংসারে দুঃখ আছে; নিস্তারের উপায় নাই; কিন্তু জীবনের কর্তব্য সম্পাদন কর, সমাজের সেবা কর, বৈরাগী হইও না; ইহাই রামায়ণের উপদেশ। শেক্সপীয়রের মনঃকল্পিত পরীরাজ্যের চঞ্চল স্ফূর্তিমত্তা দেখিয়া ইংরাজের জাতীয় জীবনের নবোদ্গত প্রফুল্ল স্ফূর্তিমত্তা মনে পড়ে, যাহা এলিজাবেথের সময় হইতে আজ পর্যন্ত সমান টানে ফুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু যেখানেই শেক্সপীয়র জীবনের রহস্য ভেদের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখানেই প্রীতির নৈরাশ্য, ধর্মের অবমাননা ও জীবনের নিষ্ফলতার উষ্ণ শ্বাস ফেলিয়াছেন। বন্ধুশোকার্ত টেনিসন বিশ্বলীলায় প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির

ঠাহর না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষীণপ্রাণা অসহায়া কুন্দনন্দিনীর মৃত দেহের সহিত জগৎ-সংসারের বিষবৃক্ষকেও গদ্ধ দেখিতে পারিলে শান্তির আশা কখনও-বা জন্মিতে পারে।

বিজ্ঞানের নিকটও আশার বাণী শুনা যায় না। প্রকৃতি নিষ্ঠুরা;—জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধি জন্য ব্যক্তির জীবন অহরহঃ উৎসর্গ করিতেছে। তোমার সম্মুখে সুখের পট ধরিয়া তাহারই আশায় তোমাকে নাচাইতেছে ও খাটাইতেছে; কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত বৃদ্ধি প্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে, জাতীয় জীবনের বৃদ্ধি তাহার উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যের জন্য যখন তাহার খেয়াল হইবে নিষ্ঠুরভাবে তখনই তোমায় বলিদান দিবে; তুমি যদি সুপুত্র হও, নিজের ভাবনা না ভাবিয়া প্রকৃতির কার্যে সহায়তা কর। আবার জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য, তাহাই-বা কেমন করিয়া বলি। বিজ্ঞান জীবের জাতীয় জীবনেরও যে পরিণাম দেখাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির খেয়াল ভিন্ন কোন গভীর উদ্দেশ্য আছে, বুঝা যায় না।

মোট কথা পুরস্কারের আশা নাই; ভাল ছেলে হও ত বিহিত বিধানে জীবনের কাজ কর, বৈরাগী হইও না; প্রকৃতির এই উপদেশ।

মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক্ দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জনা করিবেন।

'জিজ্ঞসা' (১৯০৪)